একুশের প্রবন্ধ ২০২৫

একুশের প্রবন্ধ ২০২৫

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ আজম

সম্পাদক
সরকার আমিন

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সহযোগী সম্পাদক
মুর্শিদা পারভীন
মোকারম হোসেন

বাংলা একাডেমি ঢাকা

একুশের প্রবন্ধ ২০২৫
মোহাম্মদ আজম

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩২/জানুয়ারি ২০২৬

বাএ ৬৫৭৬

[২০২৫-২০২৬ সপমি : সংস্কৃতি উপবিভাগ ০২]

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি
সংস্কৃতি উপবিভাগ

প্রকাশক
পরিচালক
সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
ব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলা একাডেমি প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ছয়শত টাকা

EKUSHEYR PRABANDHA 2025 [A Collection of Essays Presented in Ekushey Seminars 2025]. Chief Editor : Mohammad Azam. Editor : Sarker Amin. Executive Editor : Mohammed Mozammel Huq. Published by Director, Culture, Journal and Auditorium Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : January 2026. Price : Taka 600.00 only. US $ 60

ISBN 978-984-07-6584-3

জন-আকাঙ্ক্ষার নাট্যকলা-যাত্রা : ঐতিহ্যের পরম্পরায় জাতীয়তাবাদী শিল্পরীতি এবং অমলেন্দু বিশ্বাস

সাইদুর রহমান লিপন

বাংলাদেশের স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রীতি-পদ্ধতির সর্বাধিক জনসম্পৃক্ত একটি নাট্যধারা 'যাত্রা'। আবেগদীপ্ত বাচিক অভিনয়, বর্ধিত দেহ-বিন্যাস ও শৈলীবদ্ধ সুরেলা ছন্দে অভিনেতা দর্শকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিশিষ্ট এক শিল্পরীতি হলো এই যাত্রা। যাত্রা, অন্যনামে যাত্রাপালা, যাত্রাগান, পালাগান এবং কোথাও আবার 'নেটো'[১] নামে পরিচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিচারে কেউ আবার একে অন্যতম প্রাচীন 'অভিনেয় সাহিত্য' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলার স্থানীয় বা লোকনাট্য ঐতিহ্যের গহ্বর থেকে বিকশিত যে কয়েকটি পরিবেশনারীতি জাতীয় পর্যায়ে গণপরিসরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, যাত্রা এদের অন্যতম। গবেষকগণের মতে বিশিষ্ট এই অভিনয়রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয় ষোলো শতকের বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অধ্যাত্ম ভাববিনিময়ের সাংগীতিক পরিবেশনা 'নাটগীত' রীতি থেকে। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবতের' (১৫৪৮) উল্লেখ মতে, চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণলীলায় অংশগ্রহণ করেন এবং রুক্মিণী'র চরিত্রে অভিনয় করেন। এই পরিবেশনায় অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণ চরিত্রে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ বড়াই চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটগীত রীতির এই পরিবেশনাই পরবর্তীসময়ে 'কৃষ্ণযাত্রা'য় রূপান্তরিত হয়, যা আঠারো শতকে 'কালীয়দমন যাত্রা' নামে পরিচিতি লাভ করে। "আজ সমকালীন বাংলাদেশে সাধারণভাবে 'যাত্রা' নামক যে স্থানীয় নাট্যরীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এরই পূর্বসূরি হচ্ছে ষোল শতকের 'কৃষ্ণযাত্রা'[২]। আন্দাজ করা অমূলক নয় যে, একদিকে নাটগীত পরিবেশনায় নৃত্য ও গীত-সংলাপের উপস্থিতি, অপরদিকে 'কৃষ্ণযাত্রা'য় তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্যসংলাপে চরিত্রাভিনয়, নৃত্য এবং গীত পরিচালনায় 'অধিকারী'র উপস্থিতি, হাস্যরসযুক্ত অভিনেতার অংশগ্রহণ, সাজ-পোশাক এবং রূপসজ্জার সুনিপুণ ব্যবহার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপাদানগুলোই পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র নাট্যরীতি হিসেবে 'যাত্রা'য় রূপান্তরের পথ দেখিয়েছিল।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো–'যাত্রা'র উদ্ভব ও উৎসমূলে ধর্মের তাগিদ থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় তা ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে সাধারণের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অভিব্যক্তি রূপায়ণের মাধ্যম বা গণ-যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় গল্প কিচ্ছা কাহিনিগুলোর সমকালীন উপস্থাপনা গণ-পরিসরে জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মিমাসা পণ্ডিত-এর বক্তব্য

যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তিনি 'ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট : স্বদেশী যাত্রা পারফরম্যান্স এন্ড এনজেন্ডারিং এ নিউএনসড ন্যাশনাল আইডিন্টিটি' প্রবন্ধে বলেন–"প্রথম থেকেই, যাত্রা গীত ও সংলাপের তাৎক্ষণিক পরিবেশনার মতো কাজ করত। এই তাৎক্ষণিক পরিবেশনা যাত্রাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সাহায্য করত। সুতরাং, যাত্রার মৌলিক গঠনতন্ত্রের মধ্যেই ছিল বিকাশ, সংযোজন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবনের ক্ষমতা। যাত্রাপালা বা যাত্রা'র নাটলিপি এমন প্রকৃতির হতেই হতো যা পরিবর্তনগুলিকে ধারণ করতে পারে"[৩]। সুতরাং যাত্রা'র আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে গ্রহণ আত্তীকরণের নমনীয় বৈশিষ্ট্য, যা সময়ের বাঁকে বাঁকে নানা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে বিচিত্র জন-আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করে বিকশিত হয়েছে, হয়েছে রূপান্তরিত।

আলোচ্য প্রবন্ধ 'যাত্রা'র রূপান্তর প্রক্রিয়া নির্ণয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। রূপান্তরের এই ধারায় অতঃপর বাংলাদেশের নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস-এর শিল্পভাষ্য ও কর্ম বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।

রূপান্তরে বাংলার যাত্রা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় নাট্যকলার বিশিষ্ট রীতি যাত্রার উৎসমূলে 'কৃষ্ণযাত্রা'কে গণ্য করা হয়। ষোলো শতকের নাটগীত রীতির 'কৃষ্ণযাত্রা' অধ্যাত্ম তাড়নায় কৃষ্ণের (পরমাত্মার) সঙ্গে মানুষের (জীবাত্মার) প্রেম ও ভক্তির বিচিত্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রযত্নশীল হয়। সংগত কারণে উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে 'কৃষ্ণযাত্রা' ভক্ত/দর্শক পরিব্যাপ্ত থেকে প্রত্যক্ষ ও নিকটবর্তী যোগাযোগে আখ্যান ও ভাব-দর্শন বিনিময়ে সচেষ্ট থাকে। তবে এই নাট্যরীতি অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিকতা ও ভাব-আবেগপূর্ণ থাকায় 'মানবীয় আবেগ-অভিজ্ঞতার বিশাল পরিসরকে উপেক্ষা করে কেবল প্রেম সম্পর্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মমগ্ন হয়[৪]। ফলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেকটাই গৌণ হয়ে কেবল ভক্তিমূলক প্রেম প্রণয়ের আখ্যান উপস্থাপনাতে সীমিত হয়ে পড়ে। তথাপি 'কৃষ্ণযাত্রা' বিপুলসংখ্যক ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণের গণ-আসরে পরিণত হয়।

সতেরো শতকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দুটি গুণগত পরিবর্তন 'কৃষ্ণযাত্রা'য় অধিক জন-সম্পৃক্ততা তৈরি করে। এই শতকে 'কৃষ্ণযাত্রা' কার্যত একটি সর্বাত্মক নাট্যরীতিতে পরিণত হয়। একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন প্রচলিত জাত ও বর্ণ বলয় ভেঙে জন-জোয়ার সৃষ্টি করে। অপরদিকে বিপুলসংখ্যক পদকর্তা ও কবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা প্রচুর পরিমাণে 'কৃষ্ণযাত্রা'র নাটলিপি রচনায় আগ্রহী হন। পদকর্তা হিসেবে রূপগোস্বামী, অদ্বৈতাচার্যের নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে বাংলা অঞ্চলের আসরে আসরে 'কৃষ্ণযাত্রার' জয়জয়কার রব ওঠে। আর এরই ধারায় 'চৈতন্যযাত্রা' নামে আরেকটি নতুন নাট্যরীতি আবির্ভূত হয় এবং সাধারণের মাঝে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, নাটগীত আঙ্গিকের এই নয়া নাট্যরীতিতে কৃষ্ণ নন বরং দেবতা চরিত্ররূপে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং হাজির হলেন ভক্তের আসরে। 'কৃষ্ণযাত্রা' এবং 'চৈতন্যযাত্রা' ধর্মীয় ভাব অভিব্যক্তির রূপায়ণে অধিক আগ্রহী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভাব-আন্দোলনকে বাংলার গণপরিসরে ছড়িয়ে দিতে বিপুলসংখ্যক পদকর্তা ও কবিদের আবির্ভাব কার্যত জন-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে।

আঠারো শতকে 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'চৈতন্যযাত্রা'র জনপ্রিয়তার সমান্তরালে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু রূপান্তর ঘটে। এই সময়ে কোনো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের বর্ণনাত্মক আখ্যান থেকে বেরিয়ে গীত ও পদ্য সংলাপভিত্তিক যাত্রা আখ্যান গ্রহণ করে। এই ধারাতে শাক্তগণদের *শক্তিযাত্রা*, নাথ সিদ্ধাচার্যদের *নাথযাত্রা*, এবং পাল রাজাদের কাহিনি ভিত্তিক *পালযাত্রা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আঠারো শতকের শেষার্ধে দুটি গুণগত সংযোজনে যাত্রার উপস্থাপনরীতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, যাত্রা'র গল্প কথন বা অভিনয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক চরিত্র–নারদ ও ব্যাসদেবের মতো পৌরাণিক চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রথমবারের মতো যাত্রা তার ধর্মীয় খোলস থেকে বেরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় গ্রহণ করে–'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' যার প্রথম নিদর্শন। 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা'র কাহিনি রচিত হয়েছে কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের পালা অবলম্বন করে। এই পরিবর্তনকে 'যাত্রার আধুনিকীকরণের প্রথম প্রয়াস' বলে মন্তব্য করেন গবেষক তপন বাগচী। তিনি পশ্চিমঙ্গের বীরভূম জেলার শিতরাম অধিকারীকে এই 'নবযাত্রা'র প্রবর্তক'[৫] হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই নয়া সংযোজনকে একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন– 'এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলেই পরবর্তীকালে বাংলায় পেশাদার ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের উদ্ভব ঘটে'[৬]। পরিবর্তনের এই সূত্রে আরও অধিক দর্শক শ্রেণি ও জনদের যাত্রা'র আসরে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হলো। কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়-দমন যাত্রা, রাসযাত্রা, রাই উন্মাদিনী যাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ভাসান যাত্রা, রামযাত্রাসহ বহু বিষয়ভিত্তিক যাত্রারীতির আবির্ভাব কার্যত জন-চাহিদাকেই প্রতিফলিত করে।

তবে উনিশ শতকের যাত্রাকে 'নতুন যাত্রার যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করে প্রখ্যাত যাত্রা অভিনেতা, পরিচালক ও নাটলিপিকার মিলনকান্তি দে বলেন–'ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরিমার্জিত রূপে নতুন যাত্রার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে'[৭]। এই সময়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার–এক. পেশাদারি যাত্রা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এবং দুই. 'বিবেক' চরিত্রের অন্তর্ভুক্তিসহ যাত্রার উপস্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামোয় গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এই নতুন যাত্রা বিগত সময়ের চেয়েও আরো অধিক জনপ্রিয়, গণমুখী এবং শিল্পশৈলীর 'আদর্শ নমুনা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বলে মনে করেন গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ। ১৮৭৪ সালে বরিশালের মাচরঙ্গের 'নট্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার প্রথম পেশাদারি যাত্রা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারায় পেশাদার যাত্রাদলের প্রযোজক-ব্যবস্থাপক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথম ব্যক্তি যিনি নাটলিপি রচনায় সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সংস্কার একদিকে 'নাটলিপির সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করে' এবং স্থানীয় কবি ও নাট্যকারদের নাটলিপি রচনায় আগ্রহী করে তোলে। অপরদিকে এই প্রথম যাত্রার প্রচলিত কাহিনি কাঠামোতে 'ইউরোপীয় দ্বন্দ্বভিত্তিক নাট্য নির্মাণ-কৌশল অনুপ্রবেশ করে'[৮]। মূলত এরূপ সংস্কারের কারণেই দেশীয় নাট্যরীতিতে ইউরোপীয় নাটকের কাঠামো বিশেষ করে কাহিনি কাঠামো আত্তীকরণের সুযোগ তৈরি করে।

যাত্রার উপস্থাপন শৈলীতে অতঃপর বিশেষ ধরনের রূপান্তর ঘটে 'বিবেক' নামে একটি বিমূর্ত চরিত্রের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্যের ধারণা বিবেকই বাংলা যাত্রা নাটকের পতাকা চিহ্ন। বিবেক সম্পর্কে আরও বলা হয় যে–

Jatra's bibek figure—one of the most distinct features of modern Jatra-to interrupt the steady flow of the performance for the sake of critical reflection. Perhaps Jatra derived from the Sanskrit viveka, the Bengali term bibeka denotes a combination of concepts, including ethical judgement, discretion, and conscience.[৯]

১৮৯৪ সালে পালাকার অহীভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরাট উদ্ধার' নাটলিপিতে প্রথম 'বিবেক' চরিত্রটি অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বিবেক' চরিত্র ভাব-আবেগপূর্ণ একটি গানের মাধ্যমে কাহিনির পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বা পরিস্থিতির সংকটাপূর্ণ অবস্থায় মঞ্চে প্রবেশ করে চলমান দৃশ্যের চরিত্র বা ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য, সমালোচনা অথবা চরিত্রের নৈতিক অবস্থান ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মত প্রদান করে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন। বিমূর্ত 'বিবেক' চরিত্র কার্যত নাট্যকার স্বয়ং অথবা দর্শককে প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ প্রদর্শিত চরিত্র বা ঘটনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে বিবেক-এর আগমন প্রকারান্তরে নাট্যকার বা দর্শকের মনোকথা অথবা নৈতিক অবস্থানকেই প্রতিফলিত করে। তবে শুরুতে 'বিবেক' বিমূর্ত চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মানুষ রূপে–ভিক্ষুক, বাউল, দরবেশ ইত্যাদি চরিত্রে হাজির হয়।

এই শতকে নগরায়তনিক পরিমণ্ডলে রঙ্গালয়-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ব্যাপক জন সমর্থনের সমান্তরালে প্রথাগত যাত্রার অভিনয় শৈলীতেও বেশকিছু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে যাত্রারীতিকে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে এ সময়ে। স্থূল ভাঁড়ামো বর্জিত গীত ও কথকতার সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হয় এই পর্বে। এক্ষেত্রে যাত্রাভিনেতা মতিলাল রায়ের নামটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। নট-সম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস মতিলাল রায়কে 'যাত্রার যুগপ্রবর্তক' বলে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন, এই মতিলাল রায় 'রঙ্গালয়ে ইউরোপীয় নাট্যকলার ভিড়ে স্তিমিত হতে থাকা প্রথাগত যাত্রায় নবপ্রাণ সঞ্চার করে যাত্রাপ্রেমী বিপুল দর্শকের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সফল হয়েছিলেন'[১০]। যাত্রায় গীতের সংখ্যা ও সীমা কমিয়ে আনা, যত্রতত্র নৃত্যের ব্যবহার কমিয়ে নির্দিষ্ট চরিত্র দ্বারা গল্পের নির্ধারিত স্থানে নৃত্যের ব্যবহার করা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গল্পের ঐতিহাসিকতা বিবেচনায় সাজসজ্জা ও পোশাকের ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট থাকা এবং সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে সং বা ভাঁড় চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি যাত্রাশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে জনমুখী করে তোলে।

রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হওয়া দুটি বিশেষ পরিবর্তন বিশ শতকের যাত্রারীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়। এই প্রথম যাত্রাদলের অধিকারী নাটলিপি রচনা করা, কাহিনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা, গীত অংশে যুক্ত হয়ে সুর শৈলী সুরক্ষা করা প্রভৃতি দায়িত্ব ছেড়ে দলের মালিক অথবা ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে যাত্রারীতি থেকে বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অধিকারী এই পর্যায়ে

নাটলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বত্ব ক্রয় করা বা নাটলিপিকারের সঙ্গে চুক্তি করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেন।

দ্বিতীয়ত, গভীর ও সুনির্দিষ্ট রূপান্তর ঘটে যাত্রার গল্প ও বিষয়বস্তুতে। এই পর্বে যাত্রা আর কেবলই ধর্ম পুরাণের কাল্পনিক ভাবানুভূতিতে আটকে থাকল না, বরং স্বদেশচেতনা, সমাজচেতনা, সাম্য ও সম্প্রীতির কামনা, ভাগ-বিভাজনের যন্ত্রণা, বর্ণপ্রথা, ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত নির্যাতন, হিন্দু-মুসলমান একতা, ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে যাত্রা হাজির হলো গণমানুষের উঠানে, পালা উৎসবের আসরে, এমনকি নাগরিক মঞ্চে সর্বত্র। পূর্বের ন্যায় পুরুষ কুশীলব কর্তৃক নারী চরিত্রে অভিনয়ের রীতি পাল্টে দিয়ে নারী চরিত্রে নারী কুশীলবের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, যা ব্যাপক লোকপ্রিয়তা লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম ভাগে 'ইমাম যাত্রা'র আবির্ভাব হিন্দু দেব-দেবী ও পুরাণাশ্রিত এতদিনের যাত্রাশিল্পে তো বটেই তৎকালীন মুসলিম সমাজেও প্রবল এক ধাক্কা দেয়। তথ্যমতে জানা যায় "বরিশাল বাকেরগঞ্জের মোজাহের শিকদারের (১৯১০-১৯৮৫) গড়া 'মুসলিম যাত্রাপার্টি' মুসলমান পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল"[১১]। মীর মোশাররফ হোসেনের *বিষাদসিন্ধু* অবলম্বনে রচিত এজিদ বধ, জয়নাল উদ্ধার, সখিনার বিলাপ এই তিনটি পালা দিয়ে শুরু হয় 'ইমাম যাত্রা' পরিবেশনা। বলা বাহুল্য ইমাম যাত্রার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলার আরও অনেক মুসলিম পির, দরবেশ, আউলিয়াও যাত্রার আসরে এসে হাজির হলেন। এই ধারায় গাজীপিরকে অবলম্বন করে গাজীর যাত্রা, মাদারপির-কেন্দ্রিক মাদার যাত্রা, সত্যপিরের যাত্রা, একদেল পিরের যাত্রা, ফকির মজনু শাহ-সহ ইসলামি সুফি ঐতিহ্যের বেশ কিছু গল্প কাহিনি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জনগণের যাত্রা, স্বদেশি যাত্রা

রূপান্তরের ধারায় সর্বশেষ এবং একই সঙ্গে সর্বব্যাপী অভিঘাত সৃষ্টি করে 'স্বদেশি যাত্রা'। চারণ কবি মুকুন্দ দাসকৃত (১৮৭৯-১৯৩৫) 'স্বদেশি যাত্রা পার্টি' ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জাগরণ তৈরি করতে জন যোগাযোগের কেন্দ্র বা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। দেশি যাত্রার স্বদেশচেতনা কেবল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে নয়, বরং' ৪৭-এর পাকিস্তান থেকে '৭১ পরবর্তী বাংলার যাত্রানীতিতেও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। স্বদেশি যাত্রার এই রূপটি-ই কার্যত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসন-শোষণ, অন্যায়, অবিচার, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশবিরোধী তুমুল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গণযোগাযোগ এবং জনমতকে প্রভাবিত করে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয় স্বদেশি যাত্রা। ভাব ও বিনোদনের রীতি হিসেবে যাত্রা এবং জনসভা আন্দোলনের সমার্থক পরিভাষা হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার এক ম্যাজিস্ট্রেট যথার্থই বলেছিলেন যে, 'যাত্রা হলো এমন একটি গণযোগাযোগের রূপ যা স্বদেশি সভার বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে'[১২]। কেননা এই আন্দোলনে নানাবিধ মিডিয়া সাধারণের মাঝে প্রবলভাবে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাত্রার আসর রূপান্তরিত হয়েছিল জনগণের একাত্মবোধের মঞ্চে, যা ছিল বক্তৃতা মঞ্চের তুলনায় অধিক আকর্ষণীয়। As Aswini Kumar Dutta noted later, if the political ideas of the intellectuals were

presented before the people through jatra rather than speeches then their dissemination would have been be more effective.[১৩]

বস্তুত উনিশ শতকের শেষের অধ্যায় থেকেই, যাত্রার পাঠ এবং প্রদর্শনে উচ্চশ্রেণির সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় শুরু হয়। 'সমন্বয়ের নাট্য সংস্কৃতি পরিণামে একটি শংকর বা হাইব্রিডিটির জন্ম দেয়'[১৪]। এই হাইব্রিডিটির সংস্কৃতি বিশ শতকে আরও তীব্রতায় প্রবাহিত হয় এবং স্বদেশি নাট্য প্রদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। ফলে স্বদেশি যাত্রা অনেকাংশেই সমাজের নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের নৈতিক এবং ভাবাদর্শ বিনিময়ের আসরে রূপান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন–'মধ্যবিত্ত দর্শক, যারা নাট্য পরিবেশনা দেখতে আসেন, তারা প্রায়শই যাত্রা পরিবেশনাতেও হাজির হন। তারা যাত্রা থেকে কিছু কৌশল, রীতি, বৈশিষ্ট্য নাটকে স্থানান্তরিত করেন, প্রতিক্রিয়ায়, নাটকেরও কিছু বৈশিষ্ট্য যাত্রা পরিবেশনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন' [১৫]।

বিংশ শতাব্দীর যাত্রাপালা ঔপনিবেশিক শাসনের একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি যাত্রার জনপ্রিয়তা সরকারকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে। সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নতুন ধরনের যাত্রা 'রাষ্ট্রদ্রোহী অনুভূতি ছড়িয়ে দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম'[১৬] হিসেবে কাজ করে। স্বদেশি যুগে 'মাতৃপূজা' পালাটি বিভিন্ন স্বদেশি যাত্রা দলের অধীনে, নতুন নতুন রূপ লাভ করে এবং ব্রিটিশ শাসনের কাছে সবচেয়ে ভীতিকর যাত্রাপালার একটি হয়ে ওঠে।

বঙ্গীয় স্থানীয় দৈনিক *অমৃত বাজার পত্রিকা* ১৯০৭ সালে রাজা বাহাদুরের হাবেলিতে অনুষ্ঠিত একটি যাত্রাপালা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মতে, মুকুন্দ দাসের যাত্রা 'সরল' হলেও 'স্বদেশী ভাবাদর্শ প্রচারে সক্ষম' ছিল। পরিবেশনাটি দর্শকদের ওপর 'গভীর প্রভাব' ফেলেছিল। এই পরিবেশনার প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, এটি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা লক্ষ করেন যে, পালাটি দর্শকদের মধ্যে এমন এক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে, সকলে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত করে তুলেছিল। অপরদিকে, যশোরে মুকুন্দ দাসের একটি অনুষ্ঠানে মহিলারা উত্তেজনায় তাদের হাতে থাকা কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলেছিলেন। স্বদেশি যাত্রার দর্শক/শ্রোতারা মঞ্চের উপস্থাপনায় মুগ্ধ হতেন, ভাবে-আবেগে তাড়িত হতেন, হতেন উত্তেজিত। বস্তুত, 'যাত্রার সরলতাই দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে একাত্মতা তৈরি' করত, যা দর্শকদের মধ্যে 'উপস্থিত থাকার' অনুভূতি জাগাতো এবং এটাই ছিল প্রধান 'আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু'। স্বদেশি যাত্রা, এভাবে অভূতপূর্ব এক গণ-জাগরণী মন্ত্রে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-নগর-বন্দর সর্বত্র নজিরবিহীন প্রতিবাদী উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বদেশি পরম্পরায় অমলেন্দু বিশ্বাস

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা যাত্রাপালার বিশেষ উদ্দীপনা যদি হয় মুকুন্দ দাস এবং তাঁর স্বদেশি যাত্রা, তবে দ্বিতিয়ার্ধে রয়েছে 'বাবুল অপেরা' যাত্রাদলের অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭)। প্রথম জনের কীর্তি যদি গণ-জাগরণের যাত্রা, তবে অপর জনের কর্ম হলো দ্রোহচেতনার বিস্তার। মুকুন্দ দাস থেকে অমলেন্দু বিশ্বাস পরিণামে দুজনেই বহন করেন স্বদেশীয় রাজনীতি বা জাতীয়তাবাদের পরম্পরা।

অমলেন্দু বিশ্বাস তরুণ বয়সে চট্টগ্রামের ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের প্রগতিশীল শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। চট্টগ্রামের নাট্যচর্চার কেন্দ্র বলে খ্যাত এই প্রতিষ্ঠানে শিল্পী সংঘের ব্যানারে মঞ্চস্থ হতো নবনাট্য আন্দোলনভিত্তিক নাটক, যেমন–ছেঁড়া তার, নবান্ন, দুঃখীর ঈমান, মাটির ঘর ইত্যাদি। এখানে 'নাট্যশিল্পীরা ১৯৫০ সাল থেকে নাটক চর্চা এবং দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে লোকজ নাট্যকলা যাত্রার নিরীক্ষাধর্মী চর্চাও শুরু করেন'[১৭]। স্পষ্টতই, অমলেন্দু বিশ্বাসের নাট্যচর্চার সঙ্গে বামপন্থি রাজনৈতিক আদর্শের সংযোগ ঘটে এই শিল্পী সংঘ থেকে। পরবর্তীসময়ে তিনি মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শনানুসারী একটি বিপ্লবী সাংস্কৃতিক সংগঠন–'গণসংগীত স্কোয়াড'-এর সঙ্গেও যুক্ত হন। এটি একটি ভ্রাম্যমাণ গণসংগীত পরিবেশনাকারী সংগঠন, যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে নানা স্থানে কবিতা এবং গণসংগীত পরিবেশন করে বেড়াতো। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দুর ভাষ্য হলো–'আমাদের কাজ ছিল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে, তখনও কিন্তু আমরা পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তান নয়, পূর্ব বাংলাই বলেছি, তো গ্রাম গঞ্জে তখন আমরা জাগরণী গান, উদ্দীপনামূলক কবিতা পাঠের আসর বসাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাংলার মানুষকে স্বদেশ চেতনায় জাগিয়ে তোলা'। একজন তরুণের শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভে দীক্ষিত এই জাতীয়তাবাদী চেতনা যে পরবর্তীকালে পেশাদারি যাত্রাজীবনকেও উজ্জীবিত করেছিল তার নজির অমলেন্দুর অভিনীত এবং পরিচালিত যাত্রাপালার অসংখ্য অঙ্ক আর দৃশ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি সর্বদাই দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক অনাচার, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন এবং যাত্রাপালার গণ-পরিসরকেই ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদের ক্ষেত্র হিসেবে।

এ পর্যায়ে অমলেন্দু বিশ্বাসের বর্ণাঢ্য যাত্রাজীবনে দ্রোহচেতনার প্রতিফলন এবং আধুনিক নাটকের সান্নিধ্যে যাত্রা অভিনয়ের রীতি-পদ্ধতির রূপান্তর কতটা এবং কী মাত্রায় সম্পাদিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে ।

অমলেন্দু বিশ্বাসের অভিনয় জীবনের প্রারম্ভে রয়েছে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে দীর্ঘ ১১ বছরের আধুনিক থিয়েটার চর্চার অভিজ্ঞতা। আধুনিক নাট্যচর্চার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক পরিসরেও ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। অতঃপর ২৬ বছরের জনসংস্কৃতির প্রথাগত যাত্রাপালার পেশাদারি সম্পৃক্ততা। ফলে অমলেন্দুর প্রথাগত যাত্রা অভিনয়ের রীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক নাট্যাভিনয়ের কৌশলগত মিথস্ক্রিয়া ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে একটি অভিনব যাত্রারীতি–একক অভিনয়ের যাত্রা 'আমি অমলেন্দু বিশ্বাস বলছি' পালার দৃষ্টান্ত হাজির করা যাক। ১৭ই অক্টোবর ১৯৮৪ সাল, তৎকালীন সরকার কর্তৃক যাত্রাশিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে অমলেন্দু বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাৎক্ষণিক প্রতিবাদস্বরূপ তিনি জনতার মুখোমুখি হলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনা–একক অভিনয়ের যাত্রাপালা নিয়ে। এই পালার একটি সংলাপে অমলেন্দুর ঝাঁঝালো প্রতিবাদ ছিল ঠিক এমন–

'আচ্ছা, সরকারের খাইয়া দাইয়া কোনো কাজকাম নাই নাকি? যাত্রা ও নাটকের পাছায় এইভাবে লাগতে গেল ক্যান, এ্যাঁ? শুধু কি একখণ্ড মাটির জন্যে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি? অর্থনৈতিক মুক্তি কোথায়? সাংস্কৃতিক মুক্তি কোথায়? যাত্রা ও নাটককে একপাশে ঠেলে রেখে দেশ ও জাতির বড় বড় বুলি কপচায়, ওরা কারা?'[১৮]

উচ্চারিত এই সংলাপের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এটি প্রথাগত যাত্রাপালার উত্তেজনাপূর্ণ আবেগতাড়িত কাব্যময় সংলাপ নয়। বরং এই সংলাপ দৈনন্দিনের বাস্তবানুগ বা বাস্তবধর্মী আধুনিক নাটকের সংলাপরীতি বা শৈলী অনুসরণ করে, তথাপি প্রদর্শিত হয় যাত্রা পরিবেশনার প্রথাগত রীতি ও কাঠামো অনুসৃত অভিনয় আয়তনে। নিঃসন্দেহে এটি আধুনিক নাটকের সঙ্গে প্রথাগত যাত্রা অভিনয়ের একটি সুচিন্তিত মেলবন্ধন। যাত্রা অভিনয়ের এরূপ সংস্কার প্রসঙ্গে অমলেন্দুর অবস্থান স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন। 'বাবুল অপেরা' যাত্রাদলে নায়ক এবং নির্দেশক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর দলের অন্য সদস্যদের অভিনয়ের পদ্ধতি তাঁর কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তিনি দলের এক কর্মী–তুষারকে ডেকে আঞ্চলিক ভাষায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন–'অবা তুষার বও, তুই বেগগুণরে ডাকি ক, আঁর ডিরেকশন মতো কাম গরিব নি? যদি গইরত ন চায়, তইলে আঁরে বিদায় গরি দ বদ্দা। যাত্রা অইল যে আঁরার দ্যাশর মোস্ট পপুলার মাস মিডিয়া। যাত্রার অ্যাকটিং অত সোজা ন। ভালা অনুশীলন করন লাইব। যাত্রার গ্রামার বুঝন লাইব। উদা গরু-মইষের নান ভ্যাঁ ভ্যাঁ গইরলে যাত্রা নঅ বুইজ্জইচ না বেডা'। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতই যাত্রার সংলাপ এবং অভিনয়রীতি সংস্কারের বার্তা প্রদান করে। অমলেন্দুর অভিনীত এবং নির্দেশিত যাত্রাপালার বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে এই মিথস্ক্রিয়া নয়া অভিনয়রীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

এ পর্যায়ে অমলেন্দু বিশ্বাসের যাত্রা-জীবনে দ্রোহচেতনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের হদিস করা যেতে পারে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' যাত্রাপালায় কেন্দ্রীয় চরিত্র অমলেন্দু বিশ্বাসের বলিষ্ঠ অভিনয় উপস্থিত জনতাকে ব্যাপক আন্দোলিত করেছিল বলে জানা যায়। এই পালার একটি সংলাপে অমলেন্দুকে বলতে শোনা যায়–'ভগবান কারা জানো? যারা তোমার আমার মতো অজস্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গড়ে তুলেছে সাতমহলা ইমারত, যারা জীবন্ত মানুষের অস্থি দিয়ে বাজিয়ে চলেছে জলতরঙ্গের বাজনা, যারা বুটের ঠোক্করে সমাজব্যবস্থা তছনছ করে চালিয়ে যাচ্ছে কালো টাকার কারখানা, সেই পুঁজিপতি ভগবানদের কাছে আর কোনো আবেদন নয়, প্রার্থনা নয়–মেহনতি মানুষের সংঘশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে খুশির অট্টালিকা ভেঙে চুরমার করে কায়েম করতে হবে সংগ্রামী জনতার ন্যায্য অধিকার' (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)। গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এমন বলিষ্ঠ আর প্রতিবাদী অভিনয়ে উদ্দীপ্ত একজন দর্শক অমলেন্দু বিশ্বাসকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন– 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে, আমাদের আন্দোলনকে যাত্রাশিল্পীরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন'[১৯]। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে তাঁর অভিনীত 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' যাত্রাপালা দর্শকের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এই পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনারগাঁওয়ের অধিপতি সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ মসনদে আরোহণ করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে যে ভাষায় স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তা যেন '৭১-এর পটভূমিতে স্বাধীনতার চেতনাকে দিক থেকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত করেছিল। তাঁর অভিনীত এবং বিশেষ জনপ্রিয় আরও বেশকিছু পালা, যেমন 'হিটলার'-এ তিনি যুদ্ধবাজ একনায়কের নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন; 'লেনিন' যাত্রাপালাতে ব্যক্ত করেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়, এমনকি তাঁর অভিনয় জীবনের সর্বশেষ যাত্রা–'জানোয়ার' পালায় বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত সমাজের জয়গান গেয়ে গেছেন দৃপ্ত উচ্চারণে। তাঁর এই

অভিনয় প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদের মন্তব্য ছিল এমন–'তাঁর 'জানোয়ারের' অভিনয় কে ভুলতে পারবে!'[২০] অমলেন্দু বিশ্বাসের অভিনীত আরেকটি অনন্য যাত্রার নাম 'বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন'। তিন শতাধিক রজনী অভিনীত এই পালা তাঁকে বাংলাদেশের যাত্রা এবং নাট্যজগতে অনন্য প্রতিভার নট-সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

অমলেন্দু বিশ্বাসের কীর্তি সন্ধানে তাঁর দুটি অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, তিনি স্বদেশীয় বা জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন প্রতিবাদী শিল্পী। আজীবন তিনি দেশ ও সমাজ সংস্কারে যাত্রারীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাংলার যাত্রাকে ক্ষমতা-বলয়ের বিপরীতে জনতার কাতারে জন-আকাঙ্ক্ষার শিল্পরীতিরূপে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রথাগত যাত্রাশিল্পকে মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিমণ্ডলে রূপান্তরের অসাধারণ প্রতিভাধর একজন শিল্পী, যিনি গ্রাম এবং নগরের বৃত্তি-বলয় ভেঙে উভয় স্তরের সাধারণ জনতার মাঝে যাত্রাকে হাজির করতে নিরলস চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের বিবর্তন ও রূপান্তরের এই সুদীর্ঘ খতিয়ান বিবেচনায় বিশ শতকের যাত্রাশিল্পকে স্বদেশি চেতনায় উদ্দীপ্ত এক শিল্প-বিস্ফোরণ বলা যায়। এই শতকের যাত্রাশিল্প ধর্মীয় ভাবালুতায় আচ্ছন্ন থাকেনি, বরং সমাজ, সংসার, রাজনীতি, আর মা, মাটি, মানুষের দায় মেটাতে সর্বদাই জনতাকে রেখেছে সম্মুখে, রেখেছে আস্থায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ক্ষমতার, প্রশ্ন করেছে, অস্বীকার করেছে তাকে, এমনকি জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক দিয়েছে প্রতিরোধের। আর এ কারণেই বিশ শতকের যাত্রার ইতিহাস জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণের রূপান্তরিত এক যাত্রার ইতিহাস।

কিন্তু বিশ শতকের ধারাবাহিকতায় একবিংশ শতকের যাত্রারীতি ও নীতিকে নেহাতই নুয়ে পড়া সমঝোতার যাত্রানীতি হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এই শতকের যাত্রা জাগরণের নয়। মেনে নেওয়া, মানিয়ে চলা গোষ্ঠীবদ্ধ কিছুসংখ্যক যাত্রাদল ও দল মালিকের বিনোদনী শিল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে। শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার জাগরণী গল্প গান আজ যেন যাত্রার প্লট থেকেই উধাও হয়ে গেছে। যে শিল্পকলা সংস্কৃতি-শিকড় থেকে উৎসারিত সেই শিল্পকলা আজ অনেকটাই শিকড়বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই কথার অনুরণন শোনা যায় অমলেন্দু বিশ্বাসের অভিনীত একগুচ্ছ সংলাপে। এই সংলাপে তিনি অত্যন্ত বেদনাহত স্বরে উচ্চারণ করলেন–'কী হবে এখন যাত্রাশিল্পের? ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের যাঁতাকলে যাত্রা করেছি। এখন তো দেশকে কিছু দিতে হবে। আমি অমলেন্দু বিশ্বাস, স্বদেশভূমি প্রিয় বাংলাদেশকে নতুন কিছু উপহার দিতে চাই। জীবন-সাহিত্য-সমাজ-মা-মাটি-মানুষ সবই উঠে আসবে বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চে। কিন্তু সেরকম যাত্রাপালা কই? খাঁটি যাত্রাপালা?' (আমি অমলেন্দু বিশ্বাস, এপিসোড-৬)[২১]। এটি তাঁর কেবলই উচ্চারিত সংলাপ ছিল না। তিনি বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে বের হয়ে দেশীয় নাট্যকারদের দিয়ে নাটলিপি রচনার উদ্দ্যোগ গ্রহণে যাত্রাদলের মালিক ও পরিচালকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আগামী দিনের যাত্রার সাংগঠনিক স্বরূপ সম্পর্কে শঙ্কিত অমলেন্দু আরও বলেন–'যাত্রাকে যাত্রাওয়ালাদের সম্পত্তি মনে না করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় নাট্যসম্পদ হিসেবে গণ্য করে এর পরিচর্যা পরিচর্চা ও প্রসারে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলেই যাত্রা নামক লোকজ নাট্যকলার অপমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। নইলে মৃত্যু অবধারিত'[২২]।

একবিংশ শতকের এই সিকিভাগে এসে বাংলার যাত্রাশিল্পের দিকে ফিরে তাকালে অমলেন্দু বিশ্বাসের আশঙ্কাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়, যেন এই শিল্প থেকে সাধারণের বিযুক্তি বিচ্যুতির চেহারাটাই ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়। আজ আর কোনো মুকুন্দ বা অমলেন্দু নেই, যারা যাত্রাশিল্পকে ক্ষমতার অনুকম্পা থেকে নিজেদের দূরে রেখে ক্ষমতাকেই প্রশ্ন করতে পারে, ডাক দিতে পারে প্রতিরোধের, জনতার কাতারে থেকে জন-আকাঙ্ক্ষার যাত্রা নির্মাণ করতে পারে। হয়তো অমলেন্দু বিশ্বাস পূর্বেই তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন আগামী দিনের যাত্রার কী পরিণতি হবে–'কিছু সংখ্যক বিকৃতরুচি প্রদর্শক ও যাত্রামালিকের খামখেয়ালি যাত্রার আসরে উৎকট যৌন আবেদনপূর্ণ হিন্দি ও উর্দু গানের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। [....] সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপলব্ধি থেকে আমি বুঝেছি, যাত্রামোদী দর্শক পালানাটক উপভোগ করতেই যাত্রা আসরে ভিড় জমায়, নাচের জন্য নয়'[২৩]।

তথ্যসূত্র

১. গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, কলকাতা, ১৩৭৭ পৃ-১৫৮-৫৯
২. সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, ঢাকা,১৯৯৫, পৃ. ১৯
৩. Mimasha Pandit, Balancing Act: Swadeshi "Jatra" Performance and Engendering a Nuanced National Identity, 2015, Vol. 43, No. 7/8 pp.25-39
৪. Faubion Bowers, Theatre in the East :A Survey of Asian Dance and Drama, New York, 1956, p. 32
৫. তপন বাগচী, বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, ২০০৭,
৬. গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, কলকাতা, ১৩৭৭ পৃ-১৬৯-৭৩
৭. মিলনকান্তি দে, বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প ও অমলেন্দু বিশ্বাস, ঢাকা, ২০২০, পৃ.১৬
৮. সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, ঢাকা,১৯৯৫, পৃ. ২২
৯. Jashodhara Sen, Advocating for the Rejuvenation of Jatra Performance, Ecumenica 2019, Colorado, p. 32
১০. মিলনকান্তি দে, বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প ও অমলেন্দু বিশ্বাস, ঢাকা, ২০২০
১১. মিলনকান্তি দে, বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প ও অমলেন্দু বিশ্বাস, ঢাকা, ২০২০, পৃ.২১
১২. Mimasha Pandit, Balancing Act: Swadeshi "Jatra" Performance and Engendering a Nuanced NationalIdentity, 2015
১৩. Sudipto Chatterjee, The Colonial Staged: Theatre in Colonial Calcutta, Seagull Books, Kolkata, 2007
১৪. Ibid
১৫. Mimasha Pandit, Balancing Act: Swadeshi "Jatra" Performance and Engendering a Nuanced NationalIdentity, 2015, pp.25-39
১৬. মিলনকান্তি দে, বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প ও অমলেন্দু বিশ্বাস, ঢাকা, ২০২০, পৃ.৪৯
১৭. মিলনকান্তি দে, বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প ও অমলেন্দু বিশ্বাস, ঢাকা, ২০২০, পৃ.১২৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ:৫৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ:১১৬
২০. প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৮
২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত